প্রকৃতি কন্যা রাঙামাটি

ঠিক বর্ষার শুরুতে কলকাতা থেকে ফ্লাইটে ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই বুঝেছিলাম নদী মাতৃক দেশটির আসল সৌন্দর্য এর প্রকৃতিতে লুকিয়ে। এই জন্যই কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন , " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর " ।

এই নিয়ে বাংলাদেশে পা রেখেছি অসংখ্য বার। ঘুরেছি বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার , নির্জন দ্বীপ সেন্টমার্টিন , ইলিশের রাজ্য চাঁদপুর , চায়ের দেশ সিলেট , রসমালাইয়ের শহর কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জায়গা। কিন্তু বর্ষার শুরুতে বাংলাদেশ ভ্রমণ এই প্রথম। আর এবারের গন্তব্য বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জেলা রাঙামাটি। রাঙামাটির উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, দক্ষিণে বান্দরবান, পূর্বে মিজোরাম ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলা। এ জেলায় চাকমা, মারমা, লুসাই, রাখাইন সর্বোপরি বাঙ্গালীসহ ১৪টি জনগোষ্ঠি বসবাস করে।

রাতের রাজধানী ঢাকা থেকে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম হয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে মেঘের রাজ্য সাজেক ভ্যালির উদ্দেশ্যে। সাজেক ভ্যালি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার একটি বিখ্যাত পর্যটন স্থল। রাঙামাটির ছাদ বা সাজেক ভ্যালি রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত হলেও যাতায়াতের সুবিধার জন্য খাগড়াছড়ি হয়েই সাজেকে যেতে হয়।

সাজেক ভ্যালি -

ভোরের আলো ফুটতেই আমাদের গাড়ির ভেতরে আনাগোনা শুরু করে দিল মেঘের দল। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় যেন বরফ সাদা মেঘের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে আমাদের স্বাগত জানাতে। আমাদের গাড়ি থামলো কটেজের সামনে। কটেজের নামটি খুব সুন্দর " মেঘ মাচাং " । মেঘের রাজ্য সাজেক ভ্যালীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই মেঘ মাচাং গুলি। এখান থেকে আপনি উপভোগ করতে পারবেন মেঘ কে ভেদ করে সূর্য উদয়নের পুড়ো দৃশ্যটা, উপভোগ করতে পারবেন পাহারের উপর অবস্থিত সাজেক ভ্যালীর সবটুকু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ঝুলন্ত সেতু -

মেঘের রাজ্য সাজেক ছেড়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কাপ্তাই উপজেলা। এখানেই আছে বিখ্যাত " সিম্বল অফ রাঙামাটি - ঝুলন্ত সেতু " । কাপ্তাই লেকের দুই বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছে ৩৩৫ ফুটের রঙিন এই সেতুটি। সেতুর উপর থেকে কাপ্তাই লেকের চারিদিকের মনোরম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সময় কখন চলে যাবে বুঝতে পারবেন না।

কাপ্তাই লেক -

রাঙ্গামাটিতে বাঙালি ছাড়া দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী 'মারমা' । সেই মারমাদের দোকানেই ভর্তি রাঙ্গামাটির বাজার। হোটেল থেকে নেমেই বড় রাস্তার অন্য পাশেই বাজারের রাস্তা। বাজারের ভিতর দিয়েই ঢালু হয়ে নেমে গেছে কাপ্তাই ঘাটের পথ। মারমাদের দোকান গুলো বেশ নজরকারা। থামির দোকানই বেশি। থামি হল মারমাদের হাতে বোনা রঙিন কাপর। বাজার দেখতে দেখতে পৌঁছলাম লেক ঘাটে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল কাপ্তাই লেকে পুরো একটা দিন কাটাবো। বৃষ্টিস্নাত কাপ্তাই লেক একদিকে পাহাড় , অন্যদিকে নীল জলরাশি এবং সবুজের অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পুরো দিনের চুক্তিতে একটি সুন্দর নৌকা ভাড়া করে ভেসে পড়লাম কাপ্তাইয়ের বুকে। আমাদের নৌকার মাঝি মারমা জনগোষ্ঠীর মানুষ। আমরা ভারতীয় জেনে আমাদের শোনালো রাঙ্গামাটির ইতিহাস।

১৯৬০ দশকের শুরুতে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই অঞ্চলে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করা হয়। সে সময় রাঙ্গামাটি শহর ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে। এই বাঁধ তৈরির ফলে কর্ণফুলী অববাহিকায় রাঙ্গামাটির বিশাল এলাকা জলে ডুবে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের বৃহৎ হ্রদ 'কাপ্তাই' । এই লেকের জলের নীচেই আছে বিপুল পরিমাণে আবাদিজমি , বাড়ি-ঘর ও রাঙ্গামাটি শহর। তিনশত পঞ্চাশ বর্গমাইল রাঙ্গামাটির অংশ ডুবে রয়েছে এই নীল জলরাশির গর্ভে।

সুভলং ঝর্ণা -

নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম এক পাহাড়ি ঝর্নায় । সুভলং ঝরনা । পাহাড়ের গাঁ বেঁয়ে উঠে গেছে ঝরনা দেখতে যাওয়ার পথ । বর্ষার শুরুতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঝরনা । ঝরনার গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভয়ঙ্কর রুপ ধারন করেছে । ১৪০ ফুট উপর থেকে পাথরের ধাপে ধাপে নেমে এসেছে ঝরনার পথ ।

পেদা টিং টিং -

অন্য রকম নাম পেদা টিং টিং যার অর্থ হচ্ছে পেট টান টান। অর্থাৎ সারাদিন কাপ্তাই লেকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে দুপুরে পেটে টান পরবেই । আদিবাসী পরিচালিত একটি সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী খাবারসহ নানা পদের খাবার পাওয়া যায়। খাবার শেষে পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে অপরূপ সুন্দর সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে চোখ পড়লো সুন্দর একটি ফুলের দিকে । নৌকার মাঝি ক্যাজাই মারমা জানালেন এটি বাঁশ ফুল আরো জানালেন বাঁশ ফুল নিয়ে তাদের ভয়াবহ ইতিহাস ।

রাঙ্গামাটির এইসব পাহাড়ি বনাঞ্চলে উৎপন্ন হয় প্রচুর বাঁশ । প্রায় চৌদ্দ রকমের বাঁশ পাওয়া যায় এখানে । এই বাঁশই কাগজ তৈরির অন্যতম উপাদান। পার্বত্য অঞ্চলের বাঁশের ওপর নির্ভর করেই চন্দ্রঘোনায় গড়ে উঠেছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাগজ কল কর্ণফুলী পেপার মিলস । বাঁশ ফুলের দেখা পাওয়া খুব কঠিন । পঞ্চাশ বছরে একবার বাঁশ গাছে ফুল ধরে । একটা মানুষের জীবন দশায় বাঁশ ফুল ফুটতেও পারে আবার নাও পারে । ১৯৫৯ সালে ক্যাজাই মারমাদের পরিবার বাড়ি ঘর ফেলে রেখে কুমিল্লায় চলে যায় । কারন ১৯৫৮-১৯৫৯ সাল ভারত সহ বাংলাদেশের আদিবাসী ও উপজাতিদের জন্য ছিল চরম দুঃখের বছর । সেই সময় ভারতের মিজোরাম , মণিপুর , বাংলাদেশের বান্দরবান , রাঙ্গামাটি , খাগড়াছড়িতে বাঁশের গনপুস্পায়ন হয়েছিল । ১৯৫৮ সালে রাঙামাটিতে বাঁশ ফুল জন্মায়। সেই ফুল থেকে ফল হয় । বেশ বড়সড় ফল, জলপাইয়ের চেয়েও বড়। আর আশেপাশের সাত গ্রামের ইঁদুর আসে এই ফল খেতে । মাটি থেকে খায়, গেছো ইঁদুর গাছে চড়েও খায়। এই ফলের পুষ্টিগুণ অনেক থাকায় ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । তাই ইঁদুরের সংখ্যা বাড়তেই থাকে, হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে। বাঁশতলা থেকে এবার ইঁদুরের দল জুমে নেমে আসে, ফসলের দিকে মনোযোগী হয়। ফসল শেষ করে চলে আসে শস্যের ডোলে। ক্যাজাই মারমারা সারারাত জেগে ইঁদুর তাড়িয়ে মাত্র দশ ভাগ শস্য যা তারা উঠিয়েছিল শস্যাধারে তাও শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্যাজাই মারমারা শিকড়বাকড় ,কচুঘেঁচু আর মেটে আলু খাওয়া শুরু করে । সেগুলো শেষ হলে প্রাণে বাঁচার জন্যে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয় । ওই সময় উপজাতিদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দেয় । টাইফয়েড, টাইফাস, প্লেগ। রোগ আর পুষ্টির অভাবে দুর্বল শরীর নিয়ে তারা আর গাছের গোড়া খুঁড়ে কন্দ জাতীয় খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। যথকিঞ্চিৎ সরকারি রিলিফের খাদ্য আর ওষুধ আসার আগেই প্রাণহানি ঘটে অজস্র মানুষের ।

ক্যাজাই মারমার কথা শুনতে শুনতে সূর্যটা চোখের সামনে ডুবে গেল কাপ্তাই লেকের গভীর জলে ।